মীরা মুখোপাধ্যায়

বাস্তারের দিনলিপি

কারিগরের সন্ধানে বাস্তারে* যাবার জন্যে ঝাঁপিয়ে পড়লাম। আর্থিক সঙ্গতির অসুবিধে থাকলেও মানসিক জোরের অভাব ছিল না। তখন কলকাতা থেকে রায়পুর যেতে লাগত ১৭ টাকা।

গিয়ে গঙ্গামুণ্ডা বার করতে খুব কষ্ট হল না। তারপর তার সঙ্গে মানিক, গণেশ ঘড়ুয়াদেরও। যে বর্ণনা দেব তার সঙ্গে আজকের গঙ্গামুণ্ডার একটুও মিল নেই। সেদিনকার গঙ্গামুণ্ডা আমার কাছে বিশেষ আদরের ছিল।

বাস্তারে ঢুকেই যা সব চোখে পড়েছিল তা সবুজ ঘন বনানী আর মস্ত মস্ত লম্বা লম্বা বিশেষ উঁচু উঁচু গাছ। অতো খোলা, এখনও পিচের রাস্তা বেশি ছিল না। যেখানে ওরা ছিল সেখান থেকে গঙ্গামুণ্ডা ছিল ঠিক আড়াই মাইল দূরে।

মানিক ঘড়ুয়া রাজি হল আমাকে শেখাতে। টাকা যা চাইল তা আমার পক্ষে কষ্টের হলেও রাজি হলাম। ঠিক হল রোজ সকালে যাব। যাওয়া শুরু করলাম। গঙ্গামুণ্ডার চালা ঘরে এদের বাস ছিল।

সুন্দর একটি বেতের ঝাঁপি ঢাকা দেওয়া তাতে থাকত ওদের মোমের কাজের সরঞ্জাম। রৌদ্রস্নাত আঙিনায়— সেখানে চলত আমাদের শেখাশিখি।

প্রথম ওদের কাজ দেখতে লাগলাম। ওরা করত এবং আমি বসে বসে দেখতাম। এই ভাবে পুরো একটি সপ্তাহ দেখবার পর আস্তে আস্তে কাজ শুরু করলাম। কাজ শুরুর প্রথমে ছিল 'কুটন' মানে মাটির অন্তরগড়ন তৈরি করা। মানিক প্রথমেই বলল, এবার যেটা বলব হয়ত তুমি করবে না— কিন্তু এটা দরকার।

যাও— ছাগলের নাদি দেখিয়ে বলল, ওগুলি নিয়ে এস। ওগুলি তুলে প্রথমে জলে ভিজাবে, বলে একটি মাটির পাত্র দিল আমার হাতে। বলল এটি করা বিশেষ দরকার। আমি ওর কথা মতো কাজ করলাম। তারপর একটি শিল দেখিয়ে বলল,— এবার ওগুলিকে বাটতে হবে।

সেই মুহূর্তে একবার আমার মায়ের মুখটা মনে পড়েছিল। কিন্তু আমি মনটাকে দুর্বল হতে দিইনি। শিলে বেটে তারপর হুকুম হয়েছিল, যে যে মাটি ওখানে জড়ো

* ভাস্কর মীরা মুখোপাধ্যায় বাস্তারে গিয়েছিলেন আজ থেকে ৩১ বছর আগে। ছত্রিশগড়ের কারিগরদের কাছে তিনি কাজ শিখেছেন। সেইসব দিনের স্মৃতিচারণ করেছেন মীরা এই দিনলিপিতে।

করা ছিল, সেই মাটি বেছে তার সঙ্গে এই বাটা অংশ এক তৃতীয়াংশ করে ভালো করে মিলিয়ে নিতে হবে। তারপর শিলে রেখে একটি ধড় ও পায়ের গড়ন করতে হবে। আমি সেই মতো করলাম।

প্রথম দিন সকাল থেকে ১২টা বাজল এসব করতে। মানিক বলল, বাই, এবার চান খাওয়ার সময়। আমি বাড়িমুখো রওনা দিলাম। মানিক বলে দিল আড়াইটে তিনটেয় আবার কাজ শুরু হবে, আমি যেন সেই সময়ে ফিরি।

সকালে যখন আমি গিয়েছিলাম মানিকের বৌ কি যেন করছিল। রাঁধছিল বলে মনে হয়নি। মানিক অন্য শিলে মশলা বাটল। খুদের মতো একটা জিনিসকে ফোটাচ্ছিল তারপর এর সঙ্গে বাটা মসলা মিশিয়ে দিয়ে কি যেন করল। আরো কি তৈরি করল সেদিন দেখিনি। জিজ্ঞেস করতে লজ্জাও করছিল।

দুপুরে হেঁটে ফিরে আমার আবার হেঁটে গঙ্গামুণ্ডার ওখানে যেতে বেলা আড়াইটেই হল। এরপর মোমের কাজ দেখা। ভালো মোম— গাছ থেকে, মৌচাক ভেঙে হাট থেকে আনা। গলানো হল ও ছাঁকা হল। আমার পক্ষে সবটা নতুন, সুতরাং জলে ফেলে একটি চাকি শক্ত হল দেখে আমার খুব ভাল লেগেছিল। এই করতেই বিকেল হল। এবার আমার চলে আসবার সময়। আবার হাঁটা।

রাস্তায় কোনও ভয় ছিল না, কি দেখতাম কি ভাবতাম, আজ আর সব মনে নেই। কিন্তু আমার মন এক অপরিসীম আনন্দে ভরে থাকত।

এরকম করে প্রতিদিন যাতায়াত হত আর কাজ শেখা। এসবের মধ্যে যা সবচেয়ে বেশি শুনতাম তা হচ্ছে দণ্ডেশ্বরীর নাম।

কত কি বানাত! হাতি, ঘোড়া সব চেয়ে বেশি তার মধ্যে। হাতি হলে কখনও হত দণ্ডেশ্বরী ঘোড়া হলে 'ভৈরম।'

প্রথম ঢালাই করল একটি দণ্ডেশ্বরীর মূর্তি বোধ হয় ৬/৮ আঙুলের হবে। ছোট্ট একটি উনানের মতো দেখতে, মাটির তলা পর্যন্ত গাড়া বেশ নিচু— চমৎকার করে মাটি দিয়ে নিকোনো। নারকেল, কিছু ফুল এনেছিল, অল্প করে সিঁদুর—তাই দিয়ে পুজো হল। মন্ত্র যা বলল— 'নিরাকার ব্রহ্ম'। আমি জিজ্ঞেস করলাম নিরাকার ব্রহ্ম বলতে কি বোঝে? সে যা বোঝালো তাতে অবাক হয়ে যাবার মতো কিছু ছিল কিনা জানি না কিন্তু আমার তো সবই অবাক লাগত, তাই এই উত্তরেও অবাকই লাগল। ঝুলা তৈরি হত অনেক রকমের। কখনও সেই ঝুলা চড়ত হাতির পিঠে। এ ঝুলায় কে? 'দণ্ডেশ্বরী'। ক্লমাশ ওদের সব দেব-দেবতাদের একটি ফর্দ বানানো হল।

এরপর ওদের দণ্ডেশ্বরীর বর্ণনা। দণ্ডেশ্বরীর মূর্তি গড়ার প্রসঙ্গে একজন বললে দণ্ডেশ্বরীর দাঁত আছে— আরেকজন বললে, নেই। একজন বলল দণ্ডেশ্বরীর চার হাত। আমি বললাম, এখানে রাজবাড়িতে দেখে এলাম দণ্ডেশ্বরীর মূর্তি সে তো দশভুজা দুর্গা মূর্তি।

কারিগর মানিক বলল 'হ্যাঁ, কিন্তু এখানকার দণ্ডেবাড়ার মূর্তি যদি দেখ অবাক হয়ে যাবে। বলে নিজের গড়া একটি মূর্তির দিকে তাকিয়ে বলল, এ কিছুই হয়নি। কোথায় সেই বিকট ভাব ? এমন ভয়ঙ্কর তাঁর চাউনি, বেশিক্ষণ তার দিকে তাকিয়ে থাকা যায় না। দণ্ডেবাড়ার দণ্ডেশ্বরীর মূর্তির চার হাত ? হয়ত পাঁচ/ছয়ও হতে পারে।

প্রশ্ন করলাম, তুমি নিজে দেখনি ? বলল, দেখেছি কিন্তু সে যা ঘন অন্ধকার, সেই অন্ধকারের মধ্যে দিয়ে দেখা ; দেখলে প্রাণের ভিতর ভয় হয়।

এই ভাবে দণ্ডেশ্বরীর ওপর আমার মন আকুণ্ট হয়। ওদের বর্ণনা শুনতে শুনতে ইচ্ছে হল মন্দিরে যেতে। একদিন গিয়েও পড়লাম মন্দিরে। অদ্ভুত দণ্ডেবাড়ার এই মন্দির। কাকতীয় বংশের উপাস্য। একবার ওখানে গিয়ে দু-তিন দিন রইলাম। যে প্রতিদিন সেবা করত এ বিগ্রহের, তার কাছে কথা বলে ঠিক করে নিলাম মূর্তিটি দেখতে আমাকে সাহায্য করবে— হলও তাই।

জগদলপুরে আমি যেখানে থাকতাম সেখান থেকে মাইল ৪০ দূরে। অনেক পথ, অনেক বন ভেঙে যেতে হয়। সেখানে বাস যেত। পথে পড়ত ডাঙ্কিনী আর শঙ্কনী নদী। মন্দিরে যাওয়ার আগে বাস্তারের আদিবাসীদের জীবনের রীতির সম্পর্কে একটু বলে নেব।

ছত্তিশগড়ীদের বিষয়ে আমি খুব বেশি জানি না— তবে জগদলপুরে ও তার আশেপাশে মেলায় যে সব আদিবাসীদের তখন দেখেছি তাদের বিষয়েই বলব।

প্রথম কাজ। ভোরে উঠে থেকে ওদের কাজ। যদি দুই ভাই থাকে দুই স্ত্রী থাকে তার স্ত্রীরাও স্বামীদের কাজে সাহায্য করে। ওদের সামাজিক জীবনের বেশি ধরা কাট নেই। ওরা ওদের স্ত্রীদের ভালবাসে। কিন্তু এও দেখা গেছে একজন পুরুষ অন্য স্ত্রীর প্রতি আসক্ত হয়ে বিয়ে করেছে স্ত্রী তখন অন্য পুরুষ খুঁজে নিয়েছে। এদিক থেকে আমি খুব ঝগড়াঝাঁটি হতে দেখিনি।

এদের স্ত্রীরা পুরুষদের চেয়ে বেশি কাজ করে। পুরুষরা স্ত্রীদের জন্যে কাজ করে দেবার অপেক্ষায় থাকে। রান্না শুধু স্ত্রীরাই করে তা নয়— স্ত্রী পুরুষ মিলে মিশেই রান্না করে। সন্ধেবেলায় মদ খাবেই।

আদিবাসী কারিগরদের খুঁজে বার করতে আমার সুবিধে হত—মদের ভাঁটা দেখে। মদের ভাঁটার কাছেই এই আদিবাসীদের চালা হবে।

দশহরা মানে পুজো থেকে আরম্ভ করে আর ফাল্গুন মাস পর্যন্ত বিভিন্ন জায়গায় মাড়াই হবে। সে মেলাতে এরা পিতলের সামগ্রী নিয়ে বিক্রি করবে। সুতরাং শীতের সময় এরা পিতলের কাজ করবে সবচেয়ে বেশি। কতরকমের ঘুঙুর হবে। লাঠির মাথায় বসাতে— কোমরে বাঁধতে — হাতে বাঁধতে— পায়েও। সিঙ্গা তৈরি হবে, বাজবে। তাছাড়া দেবদেবী মূর্তি — নানারকম প্রদীপ ইত্যাদি হবে।

এদের মেলায় বড়ি পাওয়া যায়। মেয়েরা মেলার আগে ছোট ছোট বড়ি তৈরি করে ও মেলায় বিক্রি করে ও বাঙালীদের মতো বড়ি খায়।

এদের একটা অদ্ভুত রীতি ছিল। কেশকাল, রায়পুর ছাড়ার একটু পরে আসে— হয়ত ঘণ্টা দুই পর, পাহাড়ের উপর সেখানে একটি জায়গা আছে আদিবাসীদের— সে জায়গাটিকে এখানকার আদিবাসীরা 'জেল' বলত।

নতুন মূর্তি কেনার পর বাড়িতে যদি কোন দুর্ঘটনা ঘটত বা খারাপ কিছু ঘটত তাহলে সেই মূর্তিটাকে জেলে রেখে আসত। মানে সে মূর্তি বন্দী হয়ে থাকত।

প্রথমটা সেখানে গিয়ে আমিও অবাক হয়েছিলাম। কত সুন্দর সুন্দর কত রকমের মূর্তি এক জায়গায় রয়েছে, সেগুলি কিন্তু কেউ নিয়ে যায় না। যে দুঃসময়ের চাপে সে মূর্তিকে ফেলে রেখে গেছে সে সময় একটু ভাল হলেই, সে নিজেই সে মূর্তি আবার ফিরিয়ে নিয়ে যেত। আমি বলছি ৩১ বছর আগেকার কথা, এখনও তাই করে কিনা আমার জানা নেই।

মেয়েদের সাজগোজের বেশি আড়ম্বর ছিল না। নিজেদের হাতে করা সাদা একটি শাড়ী আটসাট করে পরত তাঁরা— জামা পরত না। পায়ে গহনা থাকত রূপোর— হাতেও – আর মেলার দিনে তাদের চুলে বাঁধার শোভা হাঁ করে তাকিয়ে দেখতে হত। কত রকমের খোঁপা— বড় বড়— তাতে থাকত চিরুনি, ছোট চিরুনি। এ চিরুনি মহেঞ্জোদাড়োর সময় থেকে পাওয়া যায়। মাথায় খোঁপা এমন সুন্দর করে বাহার করে করত এরা— নাচের সময় ছুটোছুটির সময় কখনও খুলে পড়তে দেখিনি। মাথায় থাকত কড়ির গহনা।

একটু অন্য কথায় যাচ্ছি, কৌশাম্বিতে নানা মাটির মূর্তি পাওয়া যায়। তাদের মাথার খোঁপা অনেকরকম বাহারের। শোনা যায় কিছু পশ্চিমী পণ্ডিতের মতে—মাথার এই বিশেষ রকম সজ্জা রোমান গ্রীকদের কাছ থেকে এসেছে। কিন্তু আমার মনে হয়— আমাদের দেশ থেকে এ কেশের বাহার ও খোঁপা বাঁধার পদ্ধতি ওসব জায়গায় মানে পশ্চিমে গিয়েছে একদিন।

কৌশাম্বির মাটির মূর্তিগুলি থেকে আরেকটি সত্য বেরিয়ে আসে তা হচ্ছে—মুক্ত বক্ষ। ঐ পুতুলগুলিতে তা করা হলে আবার অনেকের মত তা প্রাচীন গ্রীস থেকে মিনাতয়েনদের দেবী-প্রভাব ছড়িয়েছে। কিন্তু যখন মানুষ কোন ভালোমন্দের প্রভাব থেকে মুক্ত ছিল— তখন সভ্যতা এরকম ছিল।

আদিবাসীদের অতীন্দ্রিয় বোধ অতি সূক্ষ্ম ছিল। তারা খুবই হাসিখুশি আনন্দময়ী ও আনন্দময় তবু গভীর গূঢ় কোনও বোঝাবুঝি বিশ্বজগতের ভিতর যেন তাদের কাছে পরিষ্কার ছিল।

কোন কোন মেলায় বিচিত্র এক খেলার পদ্ধতি ছিল। মেলা ছাড়াও আবার শুধু এই খেলার নিয়ম ছিল। চারিদিকের লোক নিমন্ত্রিত হত। খেলা দেখাবার জন্যে।

এ খেলায় থাকত কতগুলি কিশোর বালক কখনও তারা বয়েসে যুবকও হত। একদিকে এই ছেলের দল বসত অন্যদিকে কিশোরী বা যুবতী মেয়েরা থাকত। সেদিন এদের

সাজ পোশাকের আড়ম্বর থাকত না। নিত্যকার সাদাসিধে মেয়ে ছেলে।

একদল অন্য দলকে গান গেয়ে প্রশ্ন করত নিজেদের তৈরি কোনও ধাঁধাঁ। অন্যদল সে দলকে উত্তর করত সেও গান করে। আবার ব্যক্তিগত কারুকে ব্যক্তিগত আরেকজন গান রচনা করে ধাঁধাঁর প্রশ্ন করলে—অন্যজন যদি সে প্রশ্নের ঠিক ঠিক উত্তর দিলে, সেই ছেলেটি বা মেয়েটি জিতে গেল। এ ক্ষেত্রে যে প্রশ্ন করেছিল তাকে বাড়ির মেয়ে হলে দাসী এবং ছেলে হলে ভৃত্য করবার জন্যে বেঁধে নিয়ে যেত। এতে বেশ হাসিহল্লা হত। এসব ক্ষেত্রে কখনও কখনও ছেলেমেয়ের সঙ্গে বিয়ে হয়ে যেত। এ রকম সুন্দর সুন্দর খেলার পদ্ধতি জানিনে কতদিন বাঁচবে।

বাড়ি বাড়ি পুরুষদের মধ্যে মুরগি খেলাবার একটি প্রথা ছিল। কাজের পর কোনও কোনও দিন এরা মুরগি নিয়ে বন্ধু বান্ধবদের মুরগির সঙ্গে খেলাতে আরম্ভ করত। যাকে বলে অভ্যাস করতে যেত। মুরগির একটি পায়ের সঙ্গে চাকু বেঁধে দিত।

সব চেয়ে বেশি মুরগির লড়াই দেখেছি নারানপুরের মেলাতে। খেলার জায়গা রক্তাক্ত হয়ে থাকত। মেয়েদের মুরগি খেলাতে কখনও দেখিনি!

এদের খাবার ব্যাপারে মনে হয় পেলে সবই খায় কিন্তু এরা পেত না তাই যা সব সহজে ও সস্তায় প্রাপ্য তাই কিনত ও খেত। দেরাপুরের মাড়াল, বাঁকুড়ার-কারিগরদের সঙ্গে এদের একটা খাবারের মিল ছিল। ডাল পাতলা করে তাতে সব রকম মসলা বেটে মিশিয়ে রান্না করত। এই সব রান্না এক রকম কামার— যারা পিতলের ঢালাই করে, তারা রাঁধে।

প্রতিদিন এরা স্নান করে। প্রয়োজনে একবারের বেশিও। মেয়েরা নিমপাতা আর কাঁচা-হলুদের তেল করে স্নানের আগে মাখে।

মাড়েয়া, মুরিয়াদের নিজেদের ভাষা ছিল। এদের ভাষা হালবি। তাতে ৩/৪টি ভাষা পাওয়া যায়। উড়িষ্যার ভাষা, হিন্দি, বাংলা ইত্যাদি। এরা ভাত পচিয়ে মদ করে কিংবা সাবু গাছের রস তুলে ঠিক তালের রসের মতো করে মদ করে।

শিশুকে এরা অবহেলা করে না। কাজেকর্মে গেলে গায়ের সঙ্গে বেঁধে নিয়ে যায়। ২/৩ বছরের হলেই ওদের সঙ্গে কাজ করতে বসায়, সুতরাং সে শিশুটি ৪/৫ বছরের হলে বাবা মার সঙ্গেই কিছু কিছু সৃষ্টিধর্মী কাজ করতে পারে। আজকাল অধিকাংশ শিশুই বই হাতে পড়তে যায়। আবার কোন কোন শিশু বই হাতে গাছের নিচে খেলতে লেগে যায়। এখানকার কোনও জিনিস, কোথাও পড়ে থাকলে তা সে জায়গাতেই থেকে যায়। যতক্ষণ না উক্ত লোকটি নিজে এসে তা সরিয়ে না নিয়ে যায়।

এখানকার লোক রগচটা হয়। তারা সন্ধ্যাবেলা মদ খেয়ে লোককে আহ্বান করে তাদের সঙ্গে যোগ দিতে। যদি উক্ত লোকটি যোগ দিতে না চায় তারা মদের বসে কি করবে তার কিছু ঠিক নেই। খুন করেও ফেলতে পারে—এবং পরে নিজেই থানায় গিয়ে ধরা দেবে— 'আমি খুনি' বলে।

মেয়েরা বা যে সৌভাগ্যবতী— সে দিনরাত কাজ করে। স্বামীর সেবা, স্বামীকে দেখা ইত্যাদি। তারা মেলাতে বা সন্ধেবেলায় স্বামীর সঙ্গে নাচে গায় সব করে। তারা সরল ও হাসিখুশি হয়।

একদিন আমাকে মানিক বলল— তুমি দশহরা না দেখে চলে যেও না। আমাদের মস্ত মেলা হয় (মাড়াই)।

আসল যে দণ্ডেশ্বরীকে নিয়ে যায় তাকেই তুমি দেখনি।

এরপর আবার আমি ধরমপুরা জগদ্দলপুরে ফিরছি। আমার যাত্রা শুরু হল দণ্ডেবাড়ার দণ্ডেশ্বরী মন্দিরে। সকাল থেকে আমি আকুল হয়ে আছি ঘড়ুয়াদের ঠাকুর দেখব বলে। বাস্তারে ঢুকে পর্যন্ত শুনছি দণ্ডেশ্বরীর নাম। পিতলের কাজের শুরু থেকে— দণ্ডেশ্বরীর মূর্তি হাতে অস্ত্র নিয়ে।

শুনলাম এখন যেখানে দণ্ডেশ্বরীর মন্দিরটি সেখানে এক সময় ছিল শীতলামায়ী গ্রাম-দেবীর মূর্তি। বর্তমান মূর্তিটি আনা হয় বাস্তারের রাজবংশ প্রতিষ্ঠা হলে। এরা বলল ২২ পুরুষ আগে। ৫/৬ 'শো বছর আগে। নতুন রাজবংশ ওরঙ্গল থেকে গৃহদেবী দণ্ডেশ্বরীকে নিয়ে এলেন। শীতলামায়ী নির্বাসিতা হলেন একটি পুষ্করিণীর ধারে। এখনও তিনি সেখানে।

সকাল থেকে আমি আকুল হয়ে আছি ঘড়ুয়াদের ঠাকুর দেখব বলে। বাস্তারে ঢুকে পর্যন্ত শুনেছি দণ্ডেশ্বরীর নাম। পিতলের কাজের শুরু থেকে, দণ্ডেশ্বরীর মূর্তি। নাম আর মূর্তির কথা শুনছি।

উপস্থিত হলাম যথাস্থানে। মন্দিরের সামনের আঙিনা ঢাকা। মন্দির যতদূর মনে পড়ে খুব সুরক্ষিত।

মন্দিরের ভিতর চোখ ধাঁধানো অন্ধকার। দ্বারের পর দ্বার, গভীর থেকে গভীরতর অন্ধকার। মূর্তির সম্মুখে রাখা একটি প্রদীপ, তারই সামান্য আলো গিয়ে পড়েছে মূর্তির উপর।

পুরোহিত বললে, মূর্তি রণচণ্ডীর। দাঁড়িয়ে থাকতে হল মূর্তি দর্শনের অপেক্ষায়। ভিতরে প্রবেশ নিষেধ। ক্রমে অন্ধকারের অবরোধ একটু একটু করে সরে গেল। প্রদীপ কিরণের এক-একটি পথ খুলে দিল।

দেখলাম কালো এক শিলার একটি দেবীমূর্তি। দেবীর মুখে হাসি, জয়ের হাসি, বিকট সুন্দর। মুখে ক্ষমা নেই। অন্যায় সহ্য করার মতো বিন্দুমাত্র নমনীয়তাও নেই সেই পাথরে।

দেবী মূর্তির উপরে ঝুলছে রুপোর ছাতা। এ মূর্তিকে কখনও স্থানচ্যুত করা হয় না। উৎসবে শোভাযাত্রায় যদি কখনও দণ্ডেশ্বরীর উপস্থিতির প্রয়োজন হয় তবে তাঁর ছাতাই হয় প্রতিনিধি। এই প্রতীককে বহন করবার অধিকার থাকে রাজার এবং রাজপুরোহিতের। এখানেও দেবীমূর্তি বস্ত্র দিয়ে ঢাকা। আক্ষেপ হল। এই কালোবরণ মূর্তি তাতে

পরানো সাদা শাড়ী। এখন বুঝলাম কামাররা (ঘড়ুয়া) কেন দেখেও দেখেনি দন্ডেশ্বরীকে। ঐ অন্ধকার, ঐ ভয়ানক আর সুন্দরের সংমিশ্রণ আর শাড়ী ঢাকা দেহ। দেবী চতুর্ভুজা কি ষড়ভুজা তা শাড়ীর আবরণের কল্যাণে বোঝা যায় না।

পুরোহিত শোনালো পুরানো কথা। দেবগণ এই শক্তি সৃষ্টির কালে দন্ডে দন্ডে ঘর্ষণ করেছিলেন, তাই দেবীর নাম দন্ডেশ্বরী।

কিছুদিন বাদে নারায়ণপুর থেকে পারালকোট যাবার পথে সোনপুর নামে একটি গ্রামে গিয়েছিলাম। এখানে আদিবাসীদের একটি মন্দির আছে। মূল দেবতা অধিষ্ঠিত একটি খড়ো ঘরে, শালের খুঁটির ঘর, দেওয়াল নেই। বিচিত্র এই দেব মূর্তি। নাম কুড়ুমতুল্লা। একখানি কাঠ, তার দু-পাশে আরও দু-খানা কাঠ, লতা দিয়ে বাঁধা এই ত্রিমূর্তি। একটি গোষ্ঠীর কুলদেবতা। ব্যাধি নিরাময় কল্পে।

মনে পড়ল পুরোহিত বলেছিল এই মন্দির ছিল আগে, গ্রামদেবী শীতলামাঈর। শীতলার রোগ নিরাময়ের এক প্রাচীন সংস্কার এই মন্দিরের সঙ্গে জড়িত ছিল।

দন্ডেবাড়ার পুরোহিত ও অন্যান্য সকলে আমার অত ঔৎসুক্য দেখে বার বার অনুরোধ করল এখানকার দশহরা উৎসব দেখে যেতে।

প্রবীর ভঞ্জ দেও বাস্তারের রাজা। এঁর উপর একটি ফিল্ম দেখি, দশহরার রথ উৎসবও দেখি। তার আগে যা যা দেখেছি, শুনেছি, সবই 'দন্ডেশ্বরী', তার অল্প বিবরণ রইল। মুখ চোখ না থাক। বেদীর উপর রাখা তাও দন্ডেশ্বরী। আবার পিতলের অতি সুন্দর কারুকার্য করা হাতির উপর মাহুত, মাহুতের পিছনে হাওদা—সেটি ঘেরাটোপে ঢাকা। ঘেরাটোপটি খুলে দেখালেন তাতে একজন দুলছেন। কে দুলছেন?

প্রধান বেদীর উপর মাটির ঢিবিটিকে দেখিয়ে বললেন, এই ইনি 'দন্ডেশ্বরী'।

সর্বত্র দন্ডেশ্বরী। রূপ ভিন্ন, বাহন ভিন্ন, কোথাও দ্বিভুজা, কোথাও চতুর্ভুজা, ষড়ভুজা, দশভুজা, কিন্তু সবাই দন্ডেশ্বরী। কোথাও কোথাও নামেও বৈচিত্র্য যেমন ভাংগেশ্বরী, মাণিকেশ্বরী, তবু তারাও যেন অভিন্ন।

ইতিহাস দন্ডকথা অনুযায়ী লোকমুখে যা পেয়েছি তা লিখলাম। বাস্তারে নাগবংশ রাজারা রাজত্ব করতে থাকে। এরা ৯ ভাই ছিল। মা দন্ডেশ্বরীর আদেশে ওরা উড়িষ্যায় গিয়ে ঢেংকানাল, খড়িয়াল, কালাহান্ডি, বিজয়নগর, খালিকোট, ভুবনেশ্বর, পুরী, জয়পুর, জাজপুর চলে গিয়ে রাজত্ব করতে লাগলেন। বাস্তারের মহারাজ ঔরঙ্গল থেকে এলেন। উড়িষ্যা থেকে ভাস্কর নিয়ে এলেন এঁরা—।

নাগবংশী রাজাদের রাজত্বের সময়েই বারসুর, ভৈরমগড়, কাঠে-কল্যাণ, চিন্তানার, জাগলে-গুন্ডা, ভঙ্গি, চাপকাল, গুপ্তেশ্বর, কুটুমসার— এ সমস্ত জায়গায় মন্দির— নানাপ্রকার শিল্পজনিত অট্টালিকা, থান তৈরি হয়।

দন্ডেশ্বরীর মন্দিরের ভিতর যে শিলাতে লেখা ১৬/১৭ বংশের বাস্তারের রাজার কথা। এঁরা বা দন্ডকথায় শুনলাম তখন এখানে তেলেঙ্গানা রাজবংশের একচেটিয়া রাজত্ব

চলত। তার আগে এসব রাবণ বিভীষণের ও রাক্ষসদের দেশ ছিল।
এখানকার পুরুত আবার বলতে লাগলেন এখানকার নানা দণ্ডকথা। আস্তে আস্তে দেখলাম, দেবী মূর্তির উপরে আরও একটি শিলা তাতে খোদাই একটি নৃসিংহ অবতার এবং আরও কতকগুলি অস্পষ্ট কারুকার্য। একটি নতমস্তকে কংকালী মূর্তি এবং আরও কতগুলি শায়িত অর্ধশায়িত কংকালসার মানুষের প্রতিকৃতি। যেন ক্লিষ্ট রোগাতুর মানুষ প্রাণভিক্ষা করছে।
মনে পড়ল পুরোহিত বলেছিলেন এই মন্দিরটি আগে গ্রামদেবী শীতলামাঈর ছিল। শীতলার রোগ নিরাময়ের এক প্রাচীন সংস্কার এই মন্দিরের সঙ্গে জড়িত ছিল। দণ্ডেশ্বরী এলেন আজ থেকে ৫০০ / ৬০০ বছর আগে কিন্তু নির্বাসিতা শীতলার রোগ নিরাময়ের সংস্কার রাষ্ট্র পরিবর্তন সত্ত্বেও অব্যাহত রাখা হল।
দণ্ডেশ্বরীর মন্দিরে কত ঘর আর কত মূর্তি। যেমন শাস্ত্রীয় ভাস্কর্য, কত মূর্তি দেখলাম তেমন আবার চোখকে অবাক করা আধুনিক ভাস্কর্যের খোদাই দেখলাম। সেগুলি দেখে বেশ নিশ্চিত ভাবে বলা যায় ওগুলি মাড়েয়া মুরিয়াদের খোদাই কার্যে সম্পাদিত। কতরকম আছে— কুকুর— আদিবাসীরা কাঁধে বাঁক নিয়ে, গোয়ালিনী ইত্যাদি।
এবার ভৈরমগড় যাওয়া। ভৈরমগড়, দণ্ডেবাড়া থেকে আরও ৪০ মাইল।
কে জানে কোথায় যুদ্ধ হয়েছিল মহিষাসুর আর দুর্গার। কারণ এল্লবায় গুহাতে-দেওয়ালে খচিত একটি খোদাই দেখেছি। দুর্গা যে মহিষাসুরের সঙ্গে লড়ছেন— সেই অসুর ইংরাজিতে যাদের বলা যায় বাইসেন হর্ণ মাড়িয়া সেই কথা বাংলায় বললে দাঁড়ায়, মাড়িয়ারা মাথায় মহিষ সিং এঁটে, মেলায় মেলায় নাচতে যায়।
মাথায় মহিষ সিং পরা এই মাড়িয়াদের নাচের সৌন্দর্য থেকে চোখ ফেরানো যায় না। কী তাদের ছন্দ— কী তাদের তালের গতি। আজও মনে পড়লে আমার শিহরণ লাগে। দল বেঁধে এরা নাচে, মাথায় ময়ূরের পেখম থাকে, হাতে গলায় মাথায় থাকে অজস্র কড়ির গহনা। মস্ত মস্ত মাদল নিয়ে থাকে কেউ কেউ ; মাড়েয়া মেয়েরাও নাচে এদের সঙ্গে। এদের মুখের উপরও থাকে কড়ির আর ময়ূর পালকের গহনা। সেগুলো দোলে মালার মত।
মনের গভীরে যেন একটি পুরানো ক্ষত থেকে রক্ত নিঃসৃত হতে থাকে আমার।
ডংকনী শংকনী নদী পেরিয়ে গিয়ে বন। সেই বনে আবার মস্ত মস্ত বড় বড় গাছ, এদের ভাষায় কোশাম গাছ, সেগুন গাছ, কেকাড় গাছ।
এখানে কত ভৈরবের উপস্থিতি— বন ভৈরব, চণ্ডাল ভৈরব বা টুণ্ডাল ভৈরব, ঘাট ভৈরব, জটা ভৈরব, চিনা ভৈরব (ছোট ভৈরব), পেদ্দা ভৈরব, নৌকা ভৈরব। এসব বনের ভিতর এই সুন্দর সুন্দর মূর্তি ছোট ছোট ভাঙা ভাঙা মন্দির ছড়িয়ে পড়ে আছে।
বন ভৈরবের মুখে একেবারে মাড়েয়া আদল। চিনা ভৈরব (বামন অবতার) অপূর্ব নৃত্য ভঙ্গিমায়। এখানে কোনও মূর্তির সঙ্গে কোনও মূর্তির মিল নেই। নামও অদ্ভুত,

যেমন বড় বড় ঘাসের মধ্যে দাঁড় করানো ঘোড়ায় চড়া, ঢাল তলোয়ার নিয়ে সেই পাথরের খোদাই রিলিফগুলিকে এরা বলে চোর ভগবান।

ভৈরমগড় একটি অতি প্রাচীন জায়গা। এখানে জায়গাটিকে ভালো করে দেখলে বোঝা যায় বিভিন্ন সময়ে এসেছিল আক্রমণকারী আততায়ী।

বিশাল বিশাল বনে লুকানো লুকানো পড়ে আছে ভাঙা, টুকরো, মন্দিরের ভগ্নাবশেষ। তখন অত পরিষ্কার না বুঝলেও এখন জানি ওখানে ছিল চৌষট্টিটি যোগিনীর মন্দির। যে চক্রে ছিল যোগিনীরা সে চক্র ভাঙা, যোগিনীরাও ছিন্ন ভিন্ন।

তবু যেখানেই যোগিনীর রূপ দেখেছি, পাগল হয়েছি। অপূর্ব তুলনাহীন ভাস্কর্য— ভাস্করই বা কি দক্ষতায় প্রেমে তা খোদাই করে গিয়েছেন। শিল্পীরা আমাদের শিল্পে কত দিয়ে গিয়েছেন— অপর্যাপ্ত।

ভৈরবরা কোথাও নিস্তব্ধ, কোথাও অট্টহাসি, কোথাও নৃত্যের ছন্দে সমস্ত বনকে জাগিয়ে দিচ্ছে।

সেদিনকার সকালের সেই সুন্দর নীল আকাশ, পুঞ্জ পুঞ্জ মেঘ— তারই কোলে এই ঘন বন, হাওয়ায় ঝিরঝির করে শব্দ হচ্ছে। অট্টহাসি মিলিয়ে গেছে। গাছগুলি এই বনে আকাশচুম্বী। একদিকে ভয়ঙ্কর স্তব্ধতা, অন্যদিকে প্রকৃতির এই অপূর্বতা। প্রত্যেকটি গাছ প্রত্যেকটি মূর্তির মতো স্বতন্ত্র। আম, তেঁতুল, বট, অশ্বত্থ, হাবরা, বাহেরা, তেন্দু, সেমহার চার, মহুয়া, সেগুন, বিজা, মুণ্ডি, আমলা, শিমুল ইত্যাদি। এতরকম গাছ তবু কোনটার সঙ্গে কোনটা মিলিয়ে যায়নি। এই সবুজের ভিড়েও নয়।

এখানে এগোতে এগোতে অতি সুন্দর পাথরের দরজার কাঠামো দেখলাম। এই দরজার চারপাশ দিয়ে একটি ঘেরা।

ইতিপূর্বে যে সব মূর্তি দেখেছি— সব এই সীমানার ভিতরই রাখা। এইটিই ছিল ভৈরমগড়। যে রাজা এসে জয় করেছিলেন এই স্থান—তা কাকতিয়দের অনেক পূর্বে, সেই রাজার আদেশে গড় তৈরি করেছিল এখানকার আদিবাসীরা। এই পাথরের ঘেরা আর সেই পাথরের রাস্তা। যে রাস্তা চলে গেছে ভৈরমগড় থেকে সোজা দন্ডেবাড়া। এই রাস্তা ধরেই একদিন রাজা, হাতিতে চড়ে, ঘোড়ায় চড়ে, লোক লস্কর নিয়ে, যেতেন দান্ডেওয়াড়ায়। এই গড়ের ভিতরই থাকতেন রাজা, প্রজা, মিত্র, অমাত্য, ভাস্কর আর পুরোহিত নিয়ে।

কিন্তু একজনই কি রাজা এসেছিলেন এখানে? একটু দেখলে বোঝা যায় বিভিন্ন প্রভাব, যার চিহ্ন আমরা পাই পাথরের খোদাই-এ।

একদিকে ঘোর শৈব। ভৈরব এখানকার প্রধান দেবতা। অন্যদিকে রামসীতার মন্দির। আর হনুমানের মূর্তি। চারিদিকে পাথরের উপর তেলেঙ্গানার হরফে লেখা— হয়ত ইতিহাস। কিন্তু সকলে তেলেঙ্গানার লোকেরাও এ হরফ পড়তে পারেন না।

হাঁটতে হাঁটতে কোথাও চলেছি টিলা পাহাড়ে, কোথাও নুড়ির রাস্তায়। কোথাও ঢুকছি

বাঁশঝাড়ের ভিতর— কোথাও পুকুর পাড়ে স্তম্ভিত হয়ে দেখছি চারিদিকের মূর্তি। একটি শায়িত গণেশ। এটিকে আদিবাসীরা কেটেছে তা এর পাদদেশই প্রমাণ করে। গভীর অরণ্যে ঘুরতে ঘুরতে যখন তেঁতুল গাছের নিচে কলকে গাছের তলায় এসে দাঁড়ালাম— দেখলাম আবার সেই দেবী মূর্তি— বিভিন্ন ভৈরবী মূর্তি। সেই সব যোগিনী তারা— এদের হাতে ত্রিশূল আর ডমরু। ডমরুর শব্দ বুক ভেদ করে যাচ্ছে, আসছে বনের এই নিস্তব্ধ শব্দ থেকে। এসব দেবী বা যোগিনীদের আদিবাসী নাম শুনলাম।

আশ্চর্য আদিবাসীরা এক নামে ডাকেন। এখানে বলে 'কোলাই মাতা', 'মুসরে মাতা', 'নোহাজার মাতা'। আবার মনে আছে বোরি গাঁয়ে বাস্তারের অন্য এক গাঁয়ে শুনেছি ঃ

'চিতলা দেয়ী' এক কথায় বলে 'ডোক্‌রী' (বাং ছাঁড়ি)

'লিঙ্গাদেয়ী'	,,	'ডোক্‌রী'
'কোদাই বুড়ি'	,,	'ডোক্‌রী'
'দুলার দেয়ী'কে	,,	'মুড়কি মায়ী'
রাক্ষীণ	,,	গল্পদেবী

(গল্পদেবীর গল্প আছে আরেকবার সে কথা হবে)

কারি কঙ্কালিন্‌ ওদের ভাষায় পেন্দ্রাউন্ড্রিন বলে। (যদি কালী মা হন তবে আশ্চর্য আদিবাসীরা এর সামনে মূর্তি বলি দেয় না।)

এরা একবার আমাকে বলে যে, সব দেবদেবীর সামনে বলি হতে পারে কিন্তু পেন্দ্রাউন্ড্রিনের সামনে হবে না। ওরা যাকে বলে পেন্দ্রাউন্ড্রিন কখনও দুটি মূর্তি পাশাপাশি দেখেছি। সুতরাং এ বিষয়ে ওরা খুব ওয়াকিবহাল কিনা জানি না। আমার যা মনে হয়— ওরা সত্যি মুক্ত। তাই ২ / ৪টি ছাড়া নাম সম্পর্কে ওরা একেবারে মাথা ঘামায় না। কিন্তু খুব সমীহ, ভয় ও ভক্তি থাকে।

দন্ডেশ্বরীকে কোদাই বুড়ি বলে।

ভাঙ্গারাম যদিও ভৈরম— কিন্তু তেলেগু ভাষায় ভাঙ্গারাম মানে সোনাও। কোন এক দেবীর নাম তেলেঙ্গীন। এরা সব ঘড়ুয়া যারা আমাকে নাম বলেছে— সুতরাং ভাষায় ওদের সঙ্গে মাড়েয়া মুরিয়াদের সঙ্গে কিছু তফাত আছে।

আবার দান্ডেওয়াড়া— এরপর দুর্গম পথ, নালা টিবি ক্ষেত বন ভেদ করে সেই প্রান্তর। এই প্রান্তরের চারিদিকেই বন। পশ্চিমে শুধু উঁচু উঁচু পাহাড়। দিগন্তের কোল যেন ভৈরমগড়কে সমস্ত দুঃখ থেকে লড়াই থেকে বাঁচাতে গিয়ে আপনি আপনি সারি বেঁধে দাঁড়িয়েছে এই পাহাড়গুলি। এই পাহাড়গুলিরই সামনাসামনি শুকনো উঁচু উঁচু ঘাসের উপর রাখা এই ২০টি মূর্তি। আগেই বলেছি এগুলি প্রত্যেকটিই পাথরের উপর খোদাই করা, ষোল্ধা মূর্তি। ২ থেকে আড়াই ফিট অন্তর রাখা। কোনটির হাতে তীর-ধনুক, কোনটির হাতে ঢাল, তলোয়ার, কেউ বা গদা আর ঢাল নিয়ে ছুটছে, কেউ বা

খড়্গ নিয়ে।
আদিবাসীদের 'চোর ভগবান' 'চোর দেওতা' এই শুনে আরও মনে হয়, যখন চোর দেওতারা এল—লড়াই করে মাড়েয়া, মুরিয়া, গণ্ডিয়াদের রক্ত বইয়ে দিল তখন কে এক মুরিয়া ভাস্কর ভাবল, রাতারাতি এদের মূর্তি বানিয়ে পুজো করে— এই চোর ভগবানদের খুশি করতে পারলে, হয়ত আর আমাদের রক্তপাত করবে না।
বনপথে এসে দাঁড়িয়েছি – বনপথ দিয়ে যাচ্ছে দুই আদিবাসী মেয়ে। সুতোর কাপড় আঁট সাঁট করে বাঁধা দেহের সঙ্গে। মুখগুলি হাসি-হাসি, ঢলঢলে। পিঠে বাঁধা ছেলে।
আবার ফিরছি জগদ্দলপুরে। দশহরার কদিন আগে থেকে রাজপ্রাসাদের কাছে আসতে থাকে আদিবাসীরা। কাঁধে মস্ত মস্ত কাঠ নিয়ে। ধবধবে সাদাসাদা ছোটছোট ধুতি, কখনও খালি গা কখনও একটি গেঞ্জি। অনেক লোক এল, গ্রাম থেকে গ্রাম— আদিবাসীরা মাথায় টুকরি, কাঁধে মস্ত মস্ত গাছে কাটা গুঁড়ি নিয়ে, কাঁধে পিঠে ছেলে নিয়ে। বৌরাও এসেছে স্বামীর সঙ্গে দলে দলে।
তারা কাঠ কেটে কেটে রথ তৈরি করেছে। যে কদিন ওরা রথ তৈরির জন্যে ব্যস্ত ছিল সে কদিন ঘড়ুয়া কামারদেরও দেখতে পাইনি। একদিন এরপরই শুনলাম রথ তৈরি হয়ে গেছে।
দশহরার দিন একটি বাড়ির তিন তলার উপরে গিয়ে দাঁড়ালাম। প্রাসাদের কাছেই এক ব্যবসায়ীর এই বাড়ি। উঁচুতে দাঁড়িয়ে অত লোক দেখে অবাক লাগল। কারণ সম্ভবত দশহাজার লোক কি তার বেশিও হবে— অথচ শব্দ এত কম।
একটু পরে দেখলাম শোনা যাচ্ছে, রথের পাথরে ঘষার শব্দ আর সেই সঙ্গে টানার শব্দ। সে দৃশ্য না দেখলে বোঝানো যাবে না।
রথ আসছে আসছে। রথ এল. রথের চাকার ধ্বনি ছড়িয়ে। মাঝে মাঝে আদিবাসীদের "জয় দন্ডেশ্বরী দন্ডেশ্বরী মায়ী কি জয়" বলে রব ওঠে।
এখানে রবীন্দ্রনাথের একটি কবিতার কথা মনে হলেও সে কবিতার শ্লেষ আমাকে স্পর্শ করেনি—
তখন আমার যা মনে হয়েছিল তাই চার ছত্রে লিখলাম।

পথ ভাবে আমি ধন্য চক্রেরে বহিয়া
লোক ভাবে ধন্য মোরা রথেরে টানিয়া
রাজা ভাবে প্রজা পুণ্যে মোর পুণ্য দেবী ছত্র লইয়া
অন্তর্যামী চুপ রহে সবারে আঁকড়িয়া

হাজার হাজার আদিবাসী এগিয়ে আসছে। রথ চলেছে টেনে। প্রবীর চন্দ্র ভঞ্জ দেও, রাজা, দন্ডেশ্বরীর রুপার ছাতা হাতে বসে। পরনে গৈরিক বসন। গলায় রুদ্রাক্ষের আর জবা ফুলের মালা। বড় বড় দুটি চোখ। তুলি দিয়ে আঁকা দুটি ভ্রূ। বিনীত— তাঁর পরম শক্তি ঈশ্বরীর ছত্র বহন— প্রজাদের জন্যে তাঁর এ আপ্রাণ কর্তব্য। তিনি সেখানে

প্রজাদের ভক্তির প্রতীক। তাদের সকল উপাসনা পরম শক্তিময়ীর, দণ্ডেশ্বরীর কাছে তিনি তুলে দেবেন।

আমি এমন করে সেই কুলপুরোহিত বীরেন্দ্র ভঞ্জ দেওকে দেখতে পেয়েছিলাম— কারণ একই উচ্চতায় দাঁড়িয়ে ছিলাম। তাঁর রথ ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছিল।

উপোষী রাজা ভক্তদের ভক্তি পৌঁছে দিচ্ছেন দণ্ডেশ্বরীর কাছে। সেই যে প্রজাদের এত স্নেহ করে ভালবেসে করে চলেছেন। আর হাজার হাজার আদিবাসী যেন বলছে তোমাকে আমরা ভালবাসি। আমরা ভগবানের ভাষা জানিনে, আমরা কিছু জানিনে, জানি তোমাকে, যে তুমি আমাদের কর্তব্যের ভার নাও— যে তুমি আমাদের চালাও।

পাঠক এইখানে আমাকে বলবেন, তুমি 'রিঅ্যাকসানারি'। না আমিও ঐ প্রজাদের মতো ঐ শত শত আদিবাসীদের মতো কিছু জানিনে। শুধু ওদের সঙ্গে আমার তফাত— আমি সমস্তটায় যে সৌন্দর্য আছে অবাক হয়ে দেখি। আমার সমস্ত দিয়ে এই সৌন্দর্যকে বেষ্টন করে থেকেছি। এই শত সহস্র আদিবাসীদের এক হওয়া তাঁদের রথ গড়া— তাদের দণ্ডেশ্বরীর ছাতা হাতে টানা। রাজার এই দীপ্তিময় ত্যাগী রূপ— প্রজাদের ঐ একান্ত ভালবাসা— রথের ফিরে আসার পর সেই প্রজাদের কুলপুরোহিতকে পুরোনারীদের বরণ করে নিয়ে যাওয়া। দিকে দিকে কত কত প্রদীপ জ্বলে উঠেছিল। কত শঙ্খধ্বনি। কত উলুধ্বনি হল। সবটা যেন এক অবিশ্বাস্য সঙ্গীত।

যখন রাস্তায় ভিড়ের মধ্যে রাস্তা পার হচ্ছিলাম আমরা আরেকবার অবাক হয়েছিলাম— যে কোন ধাক্কা তো লাগেইনি। গায়ে গায়ে লাগেওনি।

আমি কিছুতে ভুলতে পারি না। সভ্য এ সব দৃশ্য যে সব আজকের দিনে লুপ্ত হয়ে গিয়েছে। (লুপ্ত করা হয়নি তো ?)

সময় চলে যায়— শুনি নাঙ্গাড়ার শব্দ, জোরে— শুনি দামামা উত্তেজিত হয়ে উঠল। আস্তে আস্তে মিলিয়ে এল সৌন্দর্য। সে সব দৃশ্য ম্লান হতে লাগল।

একদিন মানিক, গণেশ এরা বলল, জান, আমাদের রাজাকে কষ্ট দেবে বলেছে। কিন্তু আদিবাসীরা বলেছে কিছুতেই ওসব হতে দেবে না।

দেশ স্বাধীন হবার পর একদল বিদেশি বাস্তারে ঘুরে বললেন— ছিঃ ছিঃ এসব কি সভ্যতা ?

তার আগে পণ্ডিত নেহেরুর সঙ্গে প্রবীরেন্দ্র ভঞ্জ দেও-র একটু গোলমাল লাগল। শুনেছি নেহেরু এক সময় বাস্তারের জন্যে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তা রাখেননি। তাছাড়া কি একটা কারণে বাস্তারের রাজা আদিবাসীদের বলতে থাকেন কোন কোন বিষয়ে। এরপর বোধহয় ৬২ সালের গোড়ায় লোহাণ্ডিগুড়াতে গুলি চলে। দুজন আদিবাসী মারাও যান। রাজা সম্পর্কে নানা রকম কথা লোকে বলে থাকত— যেমন তিনি খামখেয়ালী ছিলেন।

তার আগে আমি আরেকটি গল্প শুনি তাঁর এবং নেহেরুর বিষয়ে। নেহেরু মধ্যপ্রদেশে

কোথায় যাচ্ছিলেন হয়ত জগদলপুর দিয়েই হবে—। রাজাও বেরিয়েছিলেন গাড়িতেই। নেহেরুর গাড়ি ভঞ্জদেওর গাড়িকে বাধা দেয়। তারপর ডেকে পাঠান ভঞ্জ দেওকে। ভঞ্জ দেও বলে পাঠান তাড়া থাকলে— নেহেরুই আসতে পারেন রাজার কাছে। নেহেরু এলেন না কিন্তু সেই থেকে শুরু হয় মৌন যুদ্ধের।

বিদেশি, স্বদেশি, বিজ্ঞানীদের পাঠিয়ে পাঠিয়ে খোঁজ নেওয়া হল। ফিল্ম ওঠানো হল। তারপর ঠিক হল, আদিবাসীদের তৎকালীন কুলপুরোহিত প্রবীর ভঞ্জ দেওকে সরিয়ে দেওয়া হবে। লাগিয়ে দেওয়া হল গোলমাল তাঁর নিজেরই ভাই অথবা আত্মীয় কারু সঙ্গে মাসা জাতিও কেউ হাত মেলালেন সরকারের সঙ্গে। আরম্ভ হল বিরক্তিকর পরিস্থিতির। আদিবাসীরা রাজাকে বলল— ভয় পেওনা রাজা— আমরা আছি। আমরা থাকতে আর তোমাকে কেউ কষ্ট দিতে পারবে না। আসা-যাওয়া শুরু হল প্রজাদের কাছে রাজার আর দলে দলে প্রজারা আসতে লাগল রাজপ্রাসাদে। কতদিন এসব চলল। কে একজন বলল রাজা গণনা করে জানতে পেরেছেন উনি আর বাঁচবেন না। ওঁকে খুন করা হবে।

একদিন দান্ডেওয়াড়ার সেই দন্ডেশ্বরীর দৈনিক পুরোহিত আমাকে বললেন, রাজা দন্ডেশ্বরীর সামনে উদভ্রান্তের মতো বসে থাকেন। সরকার ওঁকে খুব কষ্ট দিচ্ছে। নিজের আত্মীয়রাও ওঁর বিরুদ্ধে গিয়েছেন।

এরপর আমি ফিরে আসি বাস্তার ছেড়ে। আসবার আগে দুঃখের ভেরি বেজে উঠেছিল তা শুনে এসেছিলাম।

২৭শে মার্চ রবিবার জগদলপুরের দন্ডকারণ্য সমাচারে বেরোলো ইংরেজি ও হিন্দিতে — Pravir Killed.

খবরের কাগজ অনুযায়ী রাত সাড়ে তিনটের সময় পুলিশের গুলি থেমেছে যাঁরা সরকারি চাকুরে ওখানে কাজ করতেন তাঁদের মুখে শুনেছি— সোমবার মানে ২৮ তারিখ, মার্চ-এ দুপুর সাড়ে তিনটে পর্যন্ত লোকে গুলি-বর্ষণ শোনে।

তাঁর মৃতদেহ এবং আরও আদিবাসীদের মৃতদেহ তাঁর ঘরে পাওয়া যায়। বহু বহু আদিবাসী রাজপ্রাসাদে তীর ধনুক বল্লম নিয়ে এসেছিল। কিন্তু সবাই মৃত।

আরেকটা খবরে বেরোয়— ১২ জন পুলিশ-এর লোক S. A. F. Subidar Shri D. D, Suroti খুব জখম হয়েছেন এবং একজন তীরবিদ্ধ অবস্থায় মহারানী হাসপাতালে যান ও অস্ত্রোপচার-এর টেবিলেই তাঁর মৃত্যু হয়।

এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা হয় পাঁচহাজার পুরুষ মেয়ে, শিশু, বিভিন্ন অস্ত্র নিয়ে যেমন তীর, বল্লম, ধনু, টাঙ্গী ইত্যাদি নিয়ে পুলিশের গাড়িকে আক্রমণ করে।

কিন্তু তার আগে প্রবীরচন্দ্র ভঞ্জ দেও-র শুধু চিৎকার অত্যাচারিত হয়ে, শোনা যায় তাঁর ঘর থেকে।

শোনা যায় তাঁর মৃতদেহের সঙ্গে বহু আদিবাসীদের মৃতদেহ পাওয়া যায়। তাঁর ঘরের

দেওয়াল থেকে আড়াইশো বুলেটের দাগ পাওয়া যায়।
যাঁরাই তাঁকে দেখেছে ভালবেসেছে আদিবাসীদের সঙ্গে মর্মান্তিক শোকে তারা বিহ্বল হয়েছিল। তাদের সঙ্গে আমিও।
সে বার ভাদ্রমাসের শেষে আমি গেলাম জগদলপুরে।
অন্যছবি, অন্যছবি—বাস্তারকে অত্যাচার করেছে।
একটি মারিয়া মুরিয়াকে দেখতে পাইনি। সমস্ত আদিবাসীরা কোথায় পাহাড়ে পালিয়ে গেছে। এবার কোনও চাষ হয়নি। খাঁ খাঁ করছে শূন্য মাঠ। পড়ে আছে শূন্য দেশ।
সন্ধ্যা হলে কোথাও থেকে তাদের গান আর শোনা যায়নি।

"ধীরে সায় রিলি রিলি রিলি"

মনে পড়ল চোর ভগবানদের কথা। 'চোর দেওতাদের'। ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি।
জীবন থেমে থাকে না। চলে, যারা বেঁচে থাকে। আমি আবার চিলকুঠি গেলাম। গেলাম কোন্ডাগাঁও। ঝিলিমিলি বোরি গাঁও। এসব জায়গায় কাজ করলাম। দেখা হল শ্রীরাম, জম্মুরাম, মণ্ডলু, সিতাড়ি; ইত্যাদির সঙ্গে।
কাজ করতে করতে সব ভুলে গেলাম। ঢালাই করা হল। ওরা ধরমপুরাতে এসেও ঢালাই করল। তবুও পরে বুঝলাম তা যথেষ্ট নয়। অনেকবার অনেকবার ঢালাই করতে হয়। একেবারে নিজে না করলে হয় না। বুঝলাম আরও পরে।
দু-একটা মাঢ়াই হল। কোথায় সে আনন্দ? সে নাচ? এরা ভয়ে ভয়ে কথা বলে চুপি চুপি। কাঁধে করে নিয়ে যায় কলসির গাদা— ঘাম মোছে— অবিশ্বাস নিয়ে এদিক ওদিক দেখে— সন্ধ্যা না হতেই ফিরে যায় যে যায় ডেরায়।
মনে পড়ল আবার দলবেঁধে মেয়েদের গলার সুর

'ধীরে সায় রিলে রিরিলো রিরিলো
রিরিলোইয়ো রেরেলো।
ধানো বানা দেরে ও দাই
ধানো বানা দেবে ও দাই॥'

জম্মুরামদের গাইতে বললে গেয়ে উঠত

'জয় রাম হাঁর পালক সুন্দরী
গাছ মুলে গঙ্গাবাঁর গঙ্গাবাঁর!

যা যারে হনু সিন্দি ডেঁরী কিরি সীত্যাকু দেখে আসিব সীত্যাকু ডেকে আসিব।'
ওদের এ গান শিখিয়েছে উড়িষ্যা থেকে হিন্দু পুরুতেরা রামায়ণ থেকে রামায়ণ পাঠ করে।
জয়দেব বলল, দিদি কত কী হয়েছে। দুঃখের উপর কন্টের না মজার ব্যাপার?
একবার শোনা গেল হঠাৎ, রাজা মরেননি। রাজা ফিরে এসেছেন। এসে একটা অন্ধকার মতো জায়গায় কোথায় শহরের একটা চাপা জায়গায় ঝোপড়ি বেঁধে বসেছেন।
এ খবর দেখতে দেখতে সমস্ত বাস্তারে রটে গেল আর ক্রমে ক্রমে এসে সমস্ত আদিবাসী

ঝেঁটিয়ে পাহাড় গাঁ সব জায়গা থেকে এসে উপস্থিত হতে লাগল।

প্রথম কদিন তারা হাত জোড় করে চোখের জলে ভাসত। আর রাজামশাই সাধুর বেশে অন্ধকারে বসে বসে বলত, তোমরা রাম নাম কর। তার চেয়ে ভক্তি আর কিছুতে নেই। আর পশুপক্ষী যা আছে— আর খেও না। সব শেষ করে দাও।

কিছুদিন মুরগির মাংসের দাম খুব কমল। এরা দলে দলে যার যা পশুপক্ষী ছিল বেচে দিল।

সবাই প্রায় কণ্ঠী পরবার মতো। মাস ২/৩ দিন পর আরও কিছুদিন পর কি করে আস্তে আস্তে বুঝল ঐ রাজা আসল রাজা নয়। আস্তে আস্তে নিজেদের জীবনে ঘুরে এল। এমনি করে কতরকমের সমস্যা পুরাকাল থেকে ওদের জীবনে এসেছে। মরেছে, মেরেছে, পালিয়ে গেছে। বিপদ কমলে আবার উঠে দাঁড়িয়েছে।

ওদের জীবন না জেনে, না বুঝে ওদের আমরা সভ্য করতে যাচ্ছি। ঠিক যা আমাদের উপর হয়েছিল। আমাদের শিক্ষার যে ব্যবস্থা ছিল, বাইরে থেকে যাঁরা এসেছিলেন তাঁরা বুঝতে না পেরে আমাদের উপর যে শিক্ষা আরোপ করেছিলেন এবং যার জন্যে আজকের আমাদের মধ্যে এতরকম সমস্যা। ঠিক তাই আমরাও আদিবাসীদের উপর করতে যাচ্ছি।

কিন্তু ভোলা যায় না মাড়েয়া, মুরিয়া, গোণ্ড আদিবাসীদের জীবনের ছন্দ— ভোলা যায় না এদের নৃত্য, ভোলা যায় না এদের মেলার সুর। চলেছে এদের জীবনকে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে। ভোলা যায় না এদের পাথর আর কাঁসার মূর্তি। □